হেদায়েতের প্রথম কাফেলা

আদম থেকে সুলায়মান আ.-এর আলোকিত জীবন

মুফতি আব্দুল্লাহ

নবীদের গল্পে জীবনের পাঠ সিরিজ - ১

হেদায়েতের প্রথম কাফেলা

আদম থেকে সুলায়মান আ.-এর আলোকিত জীবন

সংকলনে

মুফতি আব্দুল্লাহ

মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী

আশরাফিয়া বুক হাউস

অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

সূচিপত্র

জান্নাত থেকে পৃথিবীতে : মানুষের প্রথম যাত্রা ১১
প্রথম রক্তের দাগ, প্রথম শিক্ষা ১৫
পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ড এবং একটি কাকের নীরব শিক্ষা.....১৯
অটল ধৈর্য্যের এক হাজার বছরের আহ্বান..... ২৩
মহাপ্লাবন ও জুদি পর্বতে নৌকার অবতরণ ২৭
অজানা মানুষকে জাতির নেতা বানালেন.....৩১
ঈমান যখন জয় করল অহংকারকে ৩৭
ন্যায়ের আলো হাতে এক রহস্যময় বাদশাহ..... ৪১
লোহার প্রাচীর ও বিনয়ের মুকুট ৪৫
আগুন যখন ফুলের বাগান হয়ে গেল.....৫০
অন্ধকারের বুক চিরে আলোর পথে.....৫৪
পাহাড় কেটে গড়া স্বপ্নের নগরী..... ৫৯
অলৌকিক উষ্ট্রী-আল্লাহর জীবন্ত নিদর্শন ৬৩
এক বিকট গর্জনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল শক্তিশালী নগরী.....৬৭
যে ঘটনা ঈমান জাগ্রত করে ৭২
সুলাইমান (আ.) ও সাবার রানি.....৭৬
আকাশের পথে শেষ যাত্রা.....৮৩

জান্নাত থেকে পৃথিবীতে : মানুষের প্রথম যাত্রা

রাতের আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করে। সূর্য প্রতিদিন আলো ছড়ায়, চাঁদ নরম জ্যোৎস্না বিলিয়ে দেয়। সবুজ বন, নীল নদী, সুউচ্চ পাহাড় আর অফুরন্ত সাগর-এসব দেখে কখনো কি মনে প্রশ্ন জাগে, এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের আগমন কীভাবে হলো? কেন আমরা এখানে এসেছি? আমাদের প্রকৃত বাড়ি কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে মানবজাতির প্রথম পিতা আদম (আ.)-এর জীবনের এক অপূর্ব ঘটনায়।

মানুষের সৃষ্টি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি ছিল মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান, হিকমত ও পরিকল্পনার অংশ। পৃথিবীতে মানুষ আসার অনেক আগেই আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন। এই প্রতিনিধি পৃথিবীকে গড়বে, আল্লাহর ইবাদত করবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে এবং ভালো-মন্দের পরীক্ষায় অংশ নেবে।

তারপর আল্লাহ তাআলা মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন আদম (আ.)-কে। নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণের সঞ্চার হলো। ফেরেশতারা বিস্ময়ে দেখলেন-এ এক নতুন সৃষ্টি, যে চিন্তা করবে, শিখবে, ভালোবাসবে, ভুল করবে, আবার নিজের ভুল বুঝে আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে।

আল্লাহ আদম (আ.)-কে এমন জ্ঞান দান করলেন, যা ফেরেশতাদেরও জানা ছিল না। তখন সবাই বুঝতে পারলেন, মানুষের মর্যাদা শুধু শক্তিতে নয়, জ্ঞান, ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যে।

এরপর আল্লাহ আদম (আ.)-কে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দিলেন। সেখানে ছিল না কোনো কষ্ট, ছিল না ক্ষুধা বা তৃষ্ণা, ছিল না রোগ বা মৃত্যু।

জান্নাত ছিল চিরশান্তির নিবাস। আদম (আ.)-এর সঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করা হলো হাওয়া (আ.)-কে। তাঁরা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু জান্নাতে একটি পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। এটি ছিল আনুগত্যের পরীক্ষা-মানুষ কি নিজের ইচ্ছাকে বড় করবে, নাকি আল্লাহর আদেশকে?

এদিকে ইবলিস মানুষের চিরশত্রু হয়ে গেছে। অহংকারের কারণে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, মানুষকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেবে। সে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে নানা মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত করল। বলল, এই গাছের ফল খেলে নাকি অমর হওয়া যাবে! অবশেষে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেললেন।

ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মনে গভীর অনুশোচনা জন্ম নিল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা অহংকার করলেন না, অজুহাতও দাঁড় করালেন না। চোখ ভিজে গেল অনুতাপের অশ্রুতে। তাঁরা আল্লাহর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দয়াময় আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করলেন। এরপর আল্লাহ তাঁদের পৃথিবীতে পাঠালেন।

অনেকে মনে করে, পৃথিবীতে আসা শুধু শাস্তি ছিল। কিন্তু আসলে বিষয়টি তার চেয়েও অনেক গভীর। কারণ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানোর ঘোষণা আল্লাহ আগে থেকে দিয়েছিলেন। জান্নাত ছিল মানুষের প্রথম আবাস, আর পৃথিবী হলো তার পরীক্ষার ময়দান।

এই পৃথিবীতে মানুষ পরিশ্রম করবে, জ্ঞান অর্জন করবে, পরিবার গড়বে, অন্যের উপকার করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, ভুল করলে তাওবা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে।

পৃথিবী কখনো মানুষের স্থায়ী ঠিকানা নয়। এটি এক দীর্ঘ সফরের মাঝের একটি বিরতি মাত্র। যেমন একজন ছাত্র পরীক্ষার হলে আগে ভালো ফল করার জন্য, তেমনি মানুষ পৃথিবীতে এসেছে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে জীবন কাটাবে, তাদের জন্য

আবারও খুলে যাবে জান্নাতের দরজা। সেখানে থাকবে না কোনো দুঃখ, কোনো কান্না, কোনো বিচ্ছেদ। থাকবে শুধু শান্তি, আনন্দ আর আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আদম (আ.)-এর জীবনের এই ঘটনা আমাদের একটি বড় শিক্ষা দেয়-মানুষ ভুল করতেই পারে। কিন্তু ভুল করার পর যে নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। অন্যদিকে যে অহংকার করে নিজের ভুল মানতে চায় না, সে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে।

তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন যেন আদম (আ.)-এর মতো তাওবা, বিনয় ও আল্লাহর আনুগত্যে ভরে ওঠে। মনে রাখতে হবে, আমরা পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা নই। আমাদের আসল বাড়ি জান্নাত। এই পৃথিবীর প্রতিটি ভালো কাজ, প্রতিটি নামাজ, প্রতিটি সত্য কথা, প্রতিটি দয়া ও প্রতিটি সৎকর্ম সেই চিরসুন্দর ঘরে ফিরে যাওয়ার পথকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

হয়তো একদিন, জীবনের সব পরীক্ষা শেষ হবে। তখন আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের উদ্দেশে বলবেন- এসো, তোমরা সেই জান্নাতে প্রবেশ করো, যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। আর তখনই পূর্ণতা পাবে আদম (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হওয়া মানবজাতির সেই প্রথম যাত্রা।

আজকের শিক্ষা

- আল্লাহ তাআলার প্রতিটি আদেশ মেনে চলাই প্রকৃত সফলতার পথ। একটি মাত্র অবাধ্যতাও মানুষের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে কখনো ভালো চায় না; তাই তার কুমন্ত্রণা থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।
- মানুষ ভুল করতেই পারে, কিন্তু ভুলের পর আন্তরিক তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন।
- আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হওয়া যাবে না। আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল হওয়া আমাদের জন্য আশার সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

ভাবো তো.....

- যদি তুমি আদম (আ.)-এর স্থানে থাকতে, আল্লাহর একটি আদেশ অমান্য করার পর তোমার অনুভূতি কেমন হতো?
- শয়তান আজ আমাদের কোন কোন উপায়ে ভুল পথে নেওয়ার চেষ্টা করে?
- আমরা কি প্রতিদিন নিজের ভুলগুলো নিয়ে ভেবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই?

আজকের আমল

- কোনো গুনাহের দিকে আহ্বান এলে সঙ্গে সঙ্গে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীমঙ্ক পড়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।
- আজ একটি ভালো কাজ করার নিয়ত কর-যেমন বাবা-মায়ের কথা মানা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, অথবা সময়মতো সালাত আদায় করা।
- ঘুমানোর আগে এক মিনিট নিজের সারাদিনের কাজের হিসাব নাও- আজ আমি এমন কী করেছি, যা আমাকে জান্নাতের আরও কাছে নিয়ে যাবে?

প্রথম রক্তের দাগ, প্রথম শিক্ষা

পৃথিবী তখন একেবারেই নতুন। পাহাড়গুলো যেন সদ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নদীগুলো কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। বনভূমিতে পাখিদের গান, বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ, আর বিশাল আকাশের নিচে মানুষের সংখ্যা মাত্র কয়েকজন।

এই পৃথিবীর প্রথম ঘরে বাস করতেন মানবজাতির পিতা আদম (আ.) ও মানবজাতির মাতা হাওয়া (আ.)। জান্নাতের স্মৃতি তখনও তাঁদের হৃদয়ে টাটকা। মাঝে মাঝে তাঁরা সন্তানদের বলতেন, "একদিন আমরা এমন এক স্থানে ছিলাম, যেখানে কোনো দুঃখ ছিল না, কোনো রোগ ছিল না, কোনো মৃত্যু ছিল না। কিন্তু আজ আমরা পৃথিবীতে এসেছি আল্লাহর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য।"

সন্তানরা বিস্মিত চোখে শুনত সেই গল্প।

সময়ের প্রবাহে আদম (আ.)-এর পরিবার বড় হতে লাগল। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁদের ঘরে একের পর এক সন্তান জন্ম নিতে লাগল। পৃথিবীতে তখন অন্য কোনো মানুষ ছিল না। তাই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী এক গর্ভের ছেলে অন্য গর্ভের মেয়েকে বিয়ে করত। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়।

আদম (আ.)-এর দুই ছেলের নাম ছিল-হাবিল ও কাবিল।

দুই ভাই একই ঘরে বড় হয়েছে। একই বাবার স্নেহ, একই মায়ের ভালোবাসা, একই আকাশের নিচে খেলাধুলা, একই মাটিতে হাঁটা। কিন্তু মানুষের চেহারা যেমন এক নয়, তেমনি হৃদয়ও এক নয়।

হাবিল ছিলেন কোমল হৃদয়ের, শান্ত স্বভাবের এবং আল্লাহভীরু। তিনি

পশুপালন করতেন। মাঠে মাঠে তাঁর ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়াত। তিনি জানতেন, আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অন্যদিকে কাবিল ছিলেন কৃষক। তিনি জমি চাষ করতেন। পরিশ্রমী ছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ধীরে ধীরে একটি অদৃশ্য আগাছা জন্ম নিতে লাগল-হিংসা। মানুষের অন্তরের রোগ কখনো বাইরে থেকে দেখা যায় না। একটি ছোট্ট হিংসা যদি সময়মতো দূর না করা যায়, তবে তা একদিন আগুনের মতো পুরো হৃদয় পুড়িয়ে দেয়।

একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ এলো।

দুই ভাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি পেশ করবে।

এটি ছিল কেবল পশু বা ফসল দেওয়ার পরীক্ষা নয়; এটি ছিল হৃদয়ের পরীক্ষা। মানুষ আল্লাহকে কী দিচ্ছে, তার চেয়েও বড় বিষয়-কী মন নিয়ে দিচ্ছে। হাবিল তাঁর পাল থেকে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুস্থ ও সবচেয়ে মূল্যবান একটি পশু বেছে নিলেন। তাঁর মনে একটাই কথা-"যিনি আমাকে এত কিছু দিয়েছেন, তাঁর জন্য আমার সেরাটাই হওয়া উচিত।"

অন্যদিকে কাবিল নিজের ক্ষেত থেকে এমন কিছু শস্য নিয়ে এলেন, যা ছিল নিম্নমানের। ভালো ফসল নিজের জন্য রেখে দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, "এতেই তো হবে!"

কিন্তু আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক উপহার দেখেন না; তিনি দেখেন অন্তরের ইখলাস। কিছুক্ষণ পর এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষ প্রত্যক্ষ করল।

আল্লাহ হাবিলের কুরবানি কবুল করলেন, কিন্তু কাবিলের কুরবানি প্রত্যাখ্যান করলেন।

কুরআন সংক্ষেপে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছে-

"যখন তারা উভয়ে কুরবানি পেশ করল, তখন একজনের কুরবানি কবুল করা হলো এবং অন্যজনেরটি কবুল করা হলো না।"

- সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২

কাবিলের বুকের ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। "কেন?"

"আমারটাই কেন কবুল হলো না?"

নিজের ভুল খোঁজার পরিবর্তে সে ভাইয়ের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মানুষের একটি বড় দুর্বলতা হলো-নিজের দোষ স্বীকার না করে অন্যকে দোষী ভাবা। কাবিলের চোখে তখন আর ভাই ছিল না; ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই হিংসা একসময় বিষে পরিণত হলো।

সে রাগে-ক্ষোভে বলে উঠল-

"আমি তোমাকে হত্যা করব!"

চারদিকে নীরবতা নেমে এলো। পৃথিবীতে তখনও কোনো মানুষ আরেকজন মানুষকে হত্যা করেনি। "হত্যা" শব্দটির ভয়াবহতা কেউ জানত না।

হাবিল শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন-

"আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের থেকে কবুল করেন।"

এই একটি বাক্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের এক চিরন্তন শিক্ষা- আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা সম্পদ, সৌন্দর্য বা শক্তির ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে তাকওয়া, আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়তের ওপর।

হাবিল আরও বললেন, "তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করতে হাত বাড়াব না। আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

কী অসাধারণ ধৈর্য! কী গভীর ঈমান!

কিন্তু যখন হৃদয়ের জানালা হিংসার ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, তখন সত্যের আলোও সেখানে পৌঁছাতে পারে না।

কাবিলের অন্তরে তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। সে বুঝতেই পারছে না, যে আগুন সে অন্যের জন্য জ্বালাতে চায়, সেই আগুনেই একদিন সে নিজেই পুড়ে যাবে।

এভাবেই মানবজাতির ইতিহাস এক ভয়ঙ্কর মোড়ের দিকে এগিয়ে চলল...

আজকের শিক্ষা

- হিংসা ও ঈর্ষা মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয়। নিয়ন্ত্রণ না করলে

তা মানুষকে ভয়াবহ অপরাধের দিকেও ঠেলে দিতে পারে। আল্লাহ বাহ্যিক রূপ বা সম্পদের দিকে নয়; মানুষের ঈমান, তাকওয়া ও আন্তরিকতার দিকে তাকান। তাই কবুল হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো তাকওয়া।

- রাগের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা একজন মুমিনের বড় গুণ। এক মুহূর্তের ক্রোধ সারাজীবনের অনুশোচনার কারণ হতে পারে।
- একজন নিরপরাধ মানুষের জীবন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তাই কারও প্রতি অন্যায়, নির্যাতন বা ক্ষতি করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- পাপ করার পর অনুতাপ কষ্ট দেয়; কিন্তু পাপ করার আগেই নিজেকে সংযত করা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাবো তো.....

- কখনো কি তুমি কারও ভালো ফলাফল, সফলতা বা প্রশংসা দেখে মনে মনে ঈর্ষা অনুভব করেছ?
- কেউ তোমার চেয়ে এগিয়ে গেলে তুমি কি তাকে টেনে নামানোর কথা ভাবো, নাকি নিজেকে আরও ভালো করার চেষ্টা করো?
- রাগের সময় তুমি কীভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো?

আজকের আমল

- আজ অন্তত একজন মানুষের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করো-আল্লাহ যেন তাকে আরও কল্যাণ দান করেন। এতে ঈর্ষার পরিবর্তে ভালোবাসা জন্মাবে।
- আজ যখনই রাগ আসবে, সঙ্গে সঙ্গে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীমঈ পড়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকার চেষ্টা করো।
- আজ নিজের অন্তর পরীক্ষা করো। যদি কারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ থাকে, আল্লাহর কাছে তা দূর করার জন্য দোয়া করো।
- আজ একটি ভালো কাজ গোপনে করো-শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, যাতে তোমার আমলও হাবিল (আ.)-এর আন্তরিক কুরবানির মতো কবুল হওয়ার যোগ্য হয়।

পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ড এবং একটি কাকের নীরব শিক্ষা

কাবিলের অন্তরে তখন এক অদৃশ্য ঝড় বইছে। যে ঝড়ের নাম-হিংসা। এই ঝড় বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মানুষের বিবেক, ভালোবাসা ও মানবিকতাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

হাবিলের কথা ছিল শান্তির কথা। তিনি প্রতিশোধের ভাষা বলেননি। শক্তির অহংকার দেখাননি। বরং ভাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন- আল্লাহ কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যার পেছনে থাকে বিশুদ্ধ নিয়ত ও তাকওয়া। কিন্তু কখনো কখনো সত্যের সবচেয়ে সুন্দর কথাও সেই হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না, যে হৃদয়ের দরজা অহংকার ও হিংসায় বন্ধ হয়ে গেছে।

কুরআন আমাদের জানায়-

"অতঃপর তার নফস তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল। আর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"

- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩০

কুরআন এখানে একটি গভীর সত্য শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেননি যে, শয়তান তাকে জোর করে হত্যা করিয়েছিল। বরং বলেছেন-"তার নফস তাকে প্ররোচিত করল।" অর্থাৎ, যখন মানুষ নিজের অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তখন সেই নফসই তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

এভাবেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল।

হাবিল নিথর হয়ে পড়ে রইলেন পৃথিবীর বুকে।

চারদিকে নেমে এলো এক অদ্ভুত নীরবতা। বাতাস যেন থমকে গেল। পাখিদের ডাকও যেন স্তব্ধ হয়ে এলো। পৃথিবী প্রথমবার দেখল মানুষের রক্ত। মানুষের হাতে মানুষের জীবন নিভে যাওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য। কিন্তু হত্যার পরও কাবিল শান্তি পেল না।

সে ভেবেছিল, ভাইকে সরিয়ে দিলেই হয়তো তার অন্তরের আগুন নিভে যাবে। কিন্তু পাপ কখনো মানুষের হৃদয়কে শান্তি দেয় না। বরং তা আরও অস্থির করে তোলে।

এখন তার সামনে নতুন প্রশ্ন-এই নিথর দেহ নিয়ে কী করবে?

মানুষ তখনও দাফনের নিয়ম জানত না। পৃথিবীতে আগে কখনো কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটেনি। তাই কাবিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় আল্লাহ তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় এমন একটি দৃশ্য দেখালেন, যা যুগে যুগে মানুষের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকবে।

কুরআন বলে-

"অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগল, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় কীভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢেকে রাখবে।" - সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩১

কাবিল বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দখতে লাগল।

একটি ছোট্ট কাক মাটি আঁচড়ে একটি গর্ত তৈরি করছে। তারপর সে বুঝিয়ে দিল-মৃতদেহকে সম্মানের সঙ্গে মাটির নিচে দাফন করতে হয়।

তখন কাবিল আফসোস করে বলে উঠল-

"হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি কি এই কাকের মতোও হতে পারলাম না, যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢেকে রাখার উপায় শিখে নেব?" - সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩১

কী গভীর এই অনুশোচনা !

কিন্তু সব অনুশোচনা সমান নয়। ভুল করার আগের অনুশোচনা মানুষকে পাপ থেকে বাঁচায়। আর পাপ করার পরের অনুশোচনা অনেক সময়

হারানো জিনিস আর ফিরিয়ে আনতে পারে না।

হাবিল আর ফিরে এলেন না।

একটি পরিবার হারাল তার এক সন্তানকে। পৃথিবী হারাল প্রথম নিরপরাধ শহীদকে। আর কাবিল হারাল নিজের অন্তরের শান্তি।

এই ঘটনার পর আল্লাহ মানবজাতিকে একটি চিরন্তন নীতি শিখিয়ে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন-

"এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য বিধান দিয়েছিলাম-যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল।"

- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩২

যদিও এই বিধান বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গে এসেছে, তবু এতে মানুষের প্রাণের মর্যাদার এক মহান শিক্ষা রয়েছে।

রাসূল ﷺ আরও সতর্ক করে বলেছেন-

"অন্যায়ভাবে যে-ই নিহত হয়, তার রক্তের গুনাহের একটি অংশ আদমের প্রথম পুত্রের ওপর বর্তায়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম হত্যার পথ চালু করেছিলেন।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

এই ঘটনা শুধু দুই ভাইয়ের গল্প নয়; এটি মানুষের অন্তরের গল্প। হিংসা যখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়, তখন ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে ওঠে। আর তাকওয়া যখন হৃদয়কে আলোকিত করে, তখন মানুষ অন্যায়ের মুখেও ধৈর্য, সংযম ও আল্লাহভীতি আঁকড়ে ধরে।

হাবিল ও কাবিলের ঘটনা আজও আমাদের কানে নীরবে বলে যায়- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ অন্যের সঙ্গে নয়; নিজের নফসের সঙ্গে। যে এই যুদ্ধে জয়ী হয়, সেই-ই প্রকৃত সফল মানুষ।

আজকের শিক্ষা

- ঈর্ষা ও হিংসা মানুষের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু। নিয়ন্ত্রণহীন হিংসা

মরুভূমি থেকে রাজপ্রাসাদ

মূসা ও ইউসুফ আ.-এর মহাকাব্যিক জীবন

মুফতি আব্দুল্লাহ

নবীদের গল্পে জীবনের পাঠ সিরিজ - ২

মরুভূমি থেকে রাজপ্রাসাদ

মূসা ও ইউসুফ আ.-এর মহাকাব্যিক জীবন

সংকলনে

মুফতি আব্দুল্লাহ

মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী

আশরাফিয়া বুক হাউস

অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

উৎসর্গ

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি–

সেই সকল শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ও শিক্ষকের প্রতি,

যাঁদের স্নেহমাখা শাসন, নিরলস পরিশ্রম ও আলোকিত আদর্শে গড়ে ওঠে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

যাঁরা শুধু অক্ষর শেখান না, শেখান জীবনের পাঠ; শুধু জ্ঞানের আলো জ্বালান না, হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেন সত্য ও সুন্দরের প্রদীপ।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন এবং তাঁদের হাতে গড়া শিক্ষার্থীদের দ্বীন ও মানবতার আলোকবর্তিকা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।



ভূমিকা

نحمد الله تعالى ونصلى على رسوله الكريم

জীবন কখনো সরল কোনো পথের নাম নয়। কখনো সামনে মরুভূমি, কখনো পেছনে বিপদ; কখনো চারদিকে বন্ধ দরজা, আবার কখনো হঠাৎ খুলে যায় এমন এক দরজা-যার কথা মানুষ কল্পনাও করেনি। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোনো অন্ধকারই শেষ অন্ধকার নয়। আল্লাহ চাইলে কূপের গভীরতা থেকেই রাজপথের সূচনা হয়।

'মরুভূমি থেকে রাজপ্রাসাদ'-মূসা ও ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকথার এই খণ্ড যেন সেই সত্যেরই জীবন্ত উপাখ্যান।

ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে আমরা দেখি-ভাইদের ষড়যন্ত্র তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করল, দাসত্ব তাঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে নিয়ে গেল, অপবাদ তাঁকে কারাগারের অন্ধকারে পৌঁছে দিল; কিন্তু কোনো অন্ধকারই তাঁর ঈমানের আলো নিভাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সেই কূপ, সেই দাসত্ব, সেই কারাগারই হয়ে উঠল আল্লাহর নির্ধারিত মহিমাময় ভবিষ্যতের পথে একেকটি সোপান।

আর মূসা (আ.)-এর জীবন-ভয়ংকর এক শাসকের সামনে সত্যের উচ্চারণ, শিশুকালে অলৌকিক রক্ষা, সমুদ্রের তীরে অসম্ভবের মতো এক মুহূর্ত এবং আল্লাহর সাহায্যে মুক্তির মহাযাত্রা। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়-পথ বন্ধ হয়ে গেলেও আল্লাহর দরজা কখনো বন্ধ হয় না।

দুই নবীর জীবন দুই রকম; কিন্তু শিক্ষা এক গভীর সত্যে এসে মিলিত হয়-আল্লাহর ওপর ভরসা কখনো বিফলে যায় না। বিপদ মানুষকে ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু ঈমান তাকে আরও দৃঢ় করে তুলতে পারে। অপমান

মানুষকে প্রতিশোধপরায়ণ করতে পারে, কিন্তু নবীদের জীবন শেখায়-ক্ষমাই হতে পারে মহত্ত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ।

এই খণ্ডের প্রতিটি গল্পের শেষে তাই রাখা হয়েছে 'আজকের শিক্ষা', 'ভাবো তো' ও 'আজকের আমল'। গল্পের ঘটনা যেন শুধু চোখের সামনে দিয়ে চলে না যায়; বরং তার শিক্ষা হৃদয়ে থামে। 'আজকের শিক্ষা' আমাদের বলে দেবে কী শিখলাম, 'ভাবো তো' আমাদের নিজের জীবনকে সেই শিক্ষার আয়নায় দেখতে শেখাবে, আর 'আজকের আমল' মনে করিয়ে দেবে-সত্যিকারের শিক্ষা তখনই পূর্ণ হয়, যখন তা জীবনে এসে কাজ করে।

হয়তো কোনো পাঠক আজ নিজেকে একটি কূপের অন্ধকারে আটকে থাকা ইউসুফের মতো অনুভব করছেন; হয়তো কারও সামনে জীবনের এক 'সমুদ্র', পেছনে অসংখ্য ভয়ের তাড়া। এই গল্পগুলো তাদের জন্য একটি নীরব বার্তা বহন করে-অন্ধকার যত গভীরই হোক, আল্লাহর আলো তার চেয়েও নিকট।

আমার আশা, এই খণ্ড পাঠকের হৃদয়ে ধৈর্য্যের শক্তি, পবিত্রতার সৌন্দর্য, ক্ষমার মহত্ত্ব এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতার দৃঢ়তা জাগিয়ে তুলবে। কারণ নবীদের গল্পের আসল সৌন্দর্য কেবল তাঁদের জীবনে নয়; তাঁদের জীবন যখন আমাদের জীবনকে বদলাতে শুরু করে, তখনই সেই সৌন্দর্য পূর্ণতা পায়।

আল্লাহ তাআলা মূসা ও ইউসুফ (আ.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবনকে ঈমান, ধৈর্য, পবিত্রতা ও তাওয়াক্কুলে সাজানোর তাওফিক আমাদের দান করুন। আমিন।

দোয়াপ্রার্থী

মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

চরমটুয়া, সদর, নোয়াখালী

১০ই রবিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরী

২৪ই আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

রক্তে রাঙা মিশর ও এক অলৌকিক শিশুর আগমন.....১১
রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠা এক নবীর ভবিষ্যৎ.....১৬
মরুভূমির দীর্ঘ পথ ও মাদইয়ানে নিরাপদ আশ্রয় ২১
ওহির প্রথম আহ্বান এবং নবুয়তের মহান দায়িত্ব ২৭
ফেরাউনের দরবারে সত্যের বজ্রধ্বনি ৩২
জাদুর ময়দানে ঈমানের বিজয় ৩৭
একের পর এক আল্লাহর নিদর্শন ও ফেরাউনের অবাধ্যতা ৪২
সাগর যখন রাস্তা হয়ে গেল ৪৬
অহংকারের প্রাসাদ যখন মাটির অতলে হারিয়ে গেল.....৫১
স্বপ্ন থেকে কূপের অন্ধকারে ৫৬
কূপ থেকে মিসরের পথে ৬১
কারাগার থেকে রাজসিংহাসন..... ৬৮
দুর্ভিক্ষ, পুনর্মিলন এবং স্বপ্নের মহিমান্বিত বাস্তবায়ন ৭৩

রক্তে রাঙা মিশর ও এক অলৌকিক শিশুর আগমন

অনেক অনেক বছর আগের কথা। পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ ছিল মিশর। আকাশ ছোয়া প্রাসাদ, সুউচ্চ স্তম্ভ, ব্যস্ত বাজার, সোনায় মোড়া রাজদরবার- সবকিছু দেখলে মনে হতো, এ যেন পৃথিবীর বুকে আরেকটি স্বর্গ।

কিন্তু সেই জাঁকজমকের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দীর্ঘশ্বাস, কান্না আর অত্যাচারের এক অন্ধকার ইতিহাস। মিশরের সিংহাসনে বসেছিল এক নিষ্ঠুর শাসক-ফেরাউন। ক্ষমতার নেশায় সে এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে একদিন ঘোষণা করল, "আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু!" মানুষের সামনে সে নিজেকে উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। রাজদরবারের লোকেরা মাথা নত করত, সৈন্যরা তার প্রতিটি আদেশ পালন করত, আর সাধারণ মানুষ ভয়ে কাঁপত।

কিন্তু সবাই তার সামনে মাথা নত করেনি।

ছিল একটি জাতি-বনী ইসরাঈল। তারা জানত, একমাত্র আল্লাহই রব। তারা ফেরাউনকে উপাস্য মানতে অস্বীকার করল। এটাই ছিল তাদের অপরাধ। তারপর শুরু হলো এক নির্মম অধ্যায়। দিনের পর দিন তাদের দিয়ে কঠিন শ্রম করানো হতো। প্রখর রোদের নিচে ইট বানাতে হতো, বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করতে হতো, ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে হতো। বিনিময়ে মিলত অপমান, ক্ষুধা আর চাবুকের আঘাত। একটি জাতিকে ধীরে ধীরে দাসে পরিণত করা হচ্ছিল। এমন সময় এক অদ্ভুত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদে।

জ্যোতিষী ও গণকেরা ফেরাউনকে জানাল, বনী ইসরাঈলের ঘরে এমন

এক পুত্র জন্ম নেবে, যার হাতেই একদিন তোমার রাজত্বের পতন ঘটবে। এই খবর শুনে ফেরাউনের বুকের ভেতর ভয় বাসা বাঁধল। যে মানুষ নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করত, সে এবার একটি অনাগত শিশুকে ভয় পেতে শুরু করল! ক্ষমতার অহংকার মানুষকে কত অসহায় করে তোলে! ফেরাউন সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর আদেশ দিল-

"বনী ইসরাঈলের ঘরে যত ছেলে শিশু জন্মাবে, সবাইকে হত্যা করো। আর কন্যা শিশুদের বাঁচিয়ে রাখো।"

সৈন্যরা দল বেঁধে ঘরে ঘরে ঢুকতে লাগল। কোথাও সদ্যোজাত শিশুর কান্না, কোথাও মায়ের আর্তচিৎকার, কোথাও বাবার অসহায় চোখের জল। মিশরের বাতাস যেন শিশুদের রক্তে ভারী হয়ে উঠল।

কত মায়ের বুক খালি হয়ে গেল!
কত ঘর নিঃশব্দ কবরস্থানে পরিণত হলো!

এই ভয়ংকর সময়েই এক সাধারণ ঘরে জন্ম নিল এক অপূর্ব শিশু। তিনি ছিলেন আল্লাহর ভবিষ্যৎ নবী-মূসা (আ.)। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর মা। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর জেগে উঠল এক অজানা আতঙ্ক।

"যদি সৈন্যরা খবর পেয়ে যায়?"
প্রতিটি শব্দে তিনি চমকে উঠতেন।
বাইরে ঘোড়ার শব্দ শুনলেই মনে হতো, বুঝি মৃত্যুদূত এসে গেছে। দিন-রাত সন্তানকে লুকিয়ে রাখতেন। কিন্তু কতদিন? ঠিক সেই সময় ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ তাঁর মায়ের অন্তরে দৃঢ় সাহস দান করলেন এবং এমন একটি নির্দেশ দিলেন, যা কোনো মায়ের জন্য কল্পনাও করা কঠিন।

আল্লাহ বললেন-

"তাকে দুধ পান করাও। যখন তার ব্যাপারে ভয় করবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। ভয় পেয়ো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

(সূরা আল-কাসাস: ৭)

এ কেমন নির্দেশ! যে সন্তানকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে মন চায় না, তাকে কি না নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে! কিন্তু এ আদেশ এসেছিল আসমানের মালিকের পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কখনো মিথ্যা হয় না। এক গভীর নীরব সকালে ছোট্ট একটি মজবুত বাক্স প্রস্তুত করা হলো। মা শিশুটিকে শেষবারের মতো বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। তার কপালে চুমু খেলেন। চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। হয়তো তিনি ফিসফিস করে বলছিলেন,

"হে আমার রব! আমার সন্তানকে আমি আপনার কাছেই সঁপে দিলাম। আপনি ছাড়া তার আর কোনো রক্ষাকারী নেই।"

তারপর কাঁপা হাতে বাক্সটি নীলনদের পানিতে ছেড়ে দিলেন। স্রোত ধীরে ধীরে বাক্সটিকে দূরে নিয়ে যেতে লাগল। মা দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখের জল ঝাপসা করে দিল পৃথিবীকে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ছিল আল্লাহর প্রতিশ্রুতির আলো। শিশুটির বড় বোন দূর থেকে বাক্সটির পিছু নিলেন। তিনি কাউকে বুঝতে দিলেন না যে বাক্সটির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক আছে। নদীর ঢেউ কখনো বাক্সটিকে ডানে, কখনো বাঁয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বাক্সকে পরিচালনা করছিলেন সৃষ্টিকর্তা নিজেই।

মানুষ ভাবে, সে পরিকল্পনা করে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। অবশেষে নদীর স্রোত বাক্সটিকে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিল, যেখানে কেউ কল্পনাও করেনি-

ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের কাছে।

প্রাসাদের লোকেরা ভাসতে থাকা বাক্সটি তুলে আনল। ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল এক অপূর্ব সুন্দর শিশু। শিশুটি কাঁদছে। তার নিষ্পাপ মুখ দেখে উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ঠিক তখনই এগিয়ে এলেন ফেরাউনের স্ত্রী-মহীয়সী আসিয়া। তিনি শিশুটির দিকে তাকিয়ে এমন মমতায় ভরে গেলেন, যেন বহুদিনের হারানো ধন ফিরে পেয়েছেন। তিনি ফেরাউনকে বললেন,

"এ শিশুকে হত্যা করো না। সে আমার ও তোমার চোখের শীতলতা হতে পারে। হয়তো তাকে আমরা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করব।"

ফেরাউন জানত না- যে শিশুকে সে নিজের প্রাসাদে স্থান দিচ্ছে, একদিন সেই শিশুই আল্লাহর আদেশে তার অহংকারের প্রাসাদ ভেঙে দেবে। আল্লাহর পরিকল্পনা কত বিস্ময়কর! যে রাজা শিশুদের হত্যা করে নিজের সিংহাসন বাঁচাতে চেয়েছিল, সেই রাজার ঘরেই আল্লাহ তাঁর নবীকে নিরাপদে লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু আরেকটি সমস্যা দেখা দিল। শিশুটি কোনো দুধমায়ের দুধই পান করছে না। রাজপ্রাসাদে একের পর এক দুধমা আনা হলো। কেউ সফল হলো না। শিশুটি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ঠিক তখন মূসা (আ.)-এর বোন এগিয়ে এসে শান্তভাবে বললেন,

"আমি কি আপনাদের এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যারা এই শিশুর যত্ন খুব ভালোভাবে করবে?"

অনুমতি মিলল। তিনি দ্রুত নিজের মাকে নিয়ে এলেন। মা শিশুটিকে কোলে নিতেই সে শান্ত হয়ে গেল। মায়ের দুধ পান করতে শুরু করল। প্রাসাদের সবাই আনন্দে আত্মহারা। কেউ বুঝতেই পারল না- এই সেই মা, যার বুক থেকে কয়েকদিন আগে শিশুটিকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল! আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। সন্তান ফিরে এল মায়ের কাছেই। তাও আবার সম্মান, নিরাপত্তা এবং পারিশ্রমিকসহ! যিনি নদীতে ভাসিয়েছিলেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই আবার নিজের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন চোখভরা কৃতজ্ঞতায়।

প্রিয় পাঠক,

মূসা (আ.)-এর জীবনের এই প্রথম অধ্যায় আমাদের শেখায়-যখন চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে, তখনও আল্লাহর রহমতের দরজা কখনো বন্ধ হয় না।

মানুষের পরিকল্পনা যত বড়ই হোক, আল্লাহর পরিকল্পনা তার চেয়েও মহান।

যে মা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর সন্তানকে শুধু রক্ষা করেননি, বরং শত্রুর প্রাসাদকে নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করেছিলেন।

আজকের শিক্ষা

- সত্য কখনো ক্ষমতা, জুলুম বা প্রচারণার কাছে মাথা নত করে না। আল্লাহর নূর শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়।
- একজন মুমিনের সাহস তার বাহুর শক্তিতে নয়; আল্লাহর ওপর অটল ঈমান ও ভরসায়।
- অহংকার মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। ফিরআউন স্পষ্ট নিদর্শন দেখেও নিজের অহংকারের কারণে ঈমান আনেনি।
- সত্যের পথে চলতে গেলে বিরোধিতা আসবে, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিকে মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে বড় মনে করতে হবে।

ভাবো তো.....

- কেউ আমার ভুল ধরিয়ে দিলে আমি কি তা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি, নাকি অহংকার করি?
- বন্ধুদের চাপে পড়ে আমি কি কখনো ভুল কাজ বা গুনাহে জড়িয়ে পড়ি?
- সত্য জানার পরও সুবিধার জন্য আমি কি কখনো তা গোপন করি?
- আমার কথা, কাজ ও আচরণ কি মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট করে?

আজকের আমল

- আজ এমন কোনো কথা, পোস্ট বা বার্তা শেয়ার করব না, যার সত্যতা আমি নিশ্চিত নই। একজন মুমিন সত্য যাচাই করে কথা বলে।
- আজ অন্তত একজনকে একটি ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করব-যেমন নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, সত্যবাদিতা বা বাবা-মায়ের খেদমত।
- আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক, কটূক্তি ও অপমানজনক মন্তব্য থেকে নিজেকে বিরত রাখব এবং ভদ্র ভাষায় কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলব।
- আজ এই দোয়া করব: "হে আল্লাহ! আমাকে সত্যকে সত্য হিসেবে চিনে তা অনুসরণ করার এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিনে তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।"

রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠা এক নবীর ভবিষ্যৎ

মিশরের রাজপ্রপ্রাসাদে এক শিশুর হাসি ধীরে ধীরে সবার মন জয় করে নিচ্ছিল। যে শিশুকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন একদিন পুরো দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, সেই শিশুই আজ তার প্রাসাদের অলংকার। এ যেন ইতিহাসের এক অপূর্ব রূপ! ফেরাউন জানত না-যার জন্য সে হাজারো নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে, সেই শিশুটিই প্রতিদিন তার চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে রক্ষা করেন, তখন পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার ক্ষতি করতে পারে না।

দুই মায়ের স্নেহে বেড়ে ওঠা

আল্লাহর অপার কৃপায় ছোট্ট মূসা (আ.) দুই মায়ের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। একদিকে জন্মদাত্রী মা- যিনি নিজের বুকের দুধ পান করিয়ে তাঁকে লালন-পালন করতেন। অন্যদিকে ফেরাউনের স্ত্রী, মহীয়সী আসিয়া- যিনি তাঁকে নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্ন করতেন। প্রাসাদের আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও মূসা (আ.) কখনো ভুলে যাননি নিজের জাতিকে। সময় যত গড়াতে লাগল, তাঁর চোখের সামনে তত স্পষ্ট হতে লাগল এক নির্মম বাস্তবতা।

রাজপ্রাসাদের ভেতরে বিলাসিতা। আর প্রাসাদের বাইরে-বনী ইসরাঈলের চোখে শুধু অশ্রু। একদিকে সোনার থালা। অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

এই বৈপরীত্য তাঁর কোমল হৃদয়কে বারবার নাড়া দিত। আল্লাহর দেওয়া-জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সে সবই অনুভব করছিল। বছর গড়িয়ে গেল। শিশুটি এক সুদর্শন, বলিষ্ঠ ও জ্ঞানী যুবকে পরিণত হলেন।

কুরআন এই সময় সম্পর্কে বলে-

"যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন এবং পরিপক্ব হলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই।" (সূরা আল-কাসাস: ১৪)

এটি ছিল নবুয়তের পূর্বের সময়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর ভবিষ্যৎ নবীকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, সাহসী, দয়ালু এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন।

এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা

একদিন শহর ছিল তুলনামূলক শান্ত। মানুষ যে যার কাজে ব্যস্ত। মূসা (আ.) শহরের একটি অংশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনলেন সাহায্যের জন্য আকুল চিৎকার। তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। দেখলেন-দুজন লোক মারামারি করছে। একজন বনী ইসরাঈলের লোক। অন্যজন কিবতী-অর্থাৎ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের একজন।

বনী ইসরাঈলী ব্যক্তি মূসা (আ.)-কে দেখে সাহায্যের আবেদন করল। সে অত্যাচারিত হচ্ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছিল মূসা (আ.)-এর স্বভাব। তিনি অত্যাচারীকে থামানোর জন্য এগিয়ে গেলেন। একটি মাত্র ঘুষি মারলেন। কিন্তু সেই আঘাতেই কিবতী লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরই সে মারা গেল। মূসা (আ.) হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কখনোই তাকে হত্যা করতে চাননি। এটি ছিল অনিচ্ছাকৃত একটি ঘটনা।

অনুতপ্ত হৃদয়ের কান্না

ঘটনার পরপরই তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, এটি একটি বড় বিপদ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দিকে ফিরে বললেন-

"হে আমার রব! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

কুরআন জানায়-

"অতঃপর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-কাসাস: ১৬)

ক্ষমা পাওয়ার পর মূসা (আ.) দৃঢ় সংকল্প করলেন-

"হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই আমি কখনো অপরাধীদের সহযোগী হব না।"

এ ছিল একজন ভবিষ্যৎ নবীর পবিত্র অঙ্গীকার।

গোপন খবর

পরদিনও মূসা (আ.) চিন্তিত ছিলেন। হঠাৎ আগের সেই বনী ইসরাঈলী লোকটিকে আবার ঝগড়া করতে দেখলেন। লোকটি আবারও তাঁর কাছে সাহায্য চাইল। মূসা (আ.) তাকে বললেন, "তুমি তো স্পষ্টই ঝগড়াটে মানুষ!" তিনি যখন এগিয়ে গেলেন, তখন লোকটি ভয়ে চিৎকার করে উঠল,

"হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে?"

এই একটি বাক্যেই গোপন ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে। কিবতী লোকেরাও বুঝে গেল-গতকালের মৃত্যুর সঙ্গে মূসা (আ.) জড়িত।

মৃত্যুদণ্ডের ষড়যন্ত্র

রাজদরবারে খবর পৌঁছে গেল। ফেরাউন ও তার সভাসদরা সিদ্ধান্ত নিল- মূসাকে হত্যা করতে হবে। তিনি এখন তাদের জন্য বিপজ্জনক। ঠিক সেই সময় এক ঈমানদার ব্যক্তি শহরের দূর প্রান্ত থেকে দৌড়ে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,

"হে মূসা! সভাসদরা তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। তুমি এখনই শহর ছেড়ে চলে যাও। আমি তোমার কল্যাণকামী।"

এক মুহূর্তও দেরি করলেন না মূসা (আ.)। না সঙ্গে কোনো সৈন্য। না কোনো বাহন। না কোনো ধন-সম্পদ। শুধু আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে তিনি মিশর ছেড়ে অজানা পথের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পেছনে পড়ে

যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন, চরিত্র ও মানবিক সৌন্দর্য

মুফতি আব্দুল্লাহ

নবীদের গল্পে জীবনের পাঠ সিরিজ - ৩

যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন, চরিত্র ও মানবিক সৌন্দর্য

সংকলনে

মুফতি আব্দুল্লাহ

মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী

আশরাফিয়া বুক হাউস

অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

উৎসর্গ

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি–

সেই সকল মমতাময়ী মা ও স্নেহশীল বাবার প্রতি,

যাঁদের দোয়ায় শিশুর জীবনে নেমে আসে রহমত, যাঁদের স্নেহে কোমল হৃদয়ে শেকড় গাড়ে ঈমান, আর যাঁদের আদর্শে সন্তান খুঁজে পায় সত্য ও সুন্দরের পথ।

যাঁরা নিজেদের স্বপ্নের চেয়েও বড় করে দেখেন সন্তানের ভবিষ্যৎ, আর সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে নীরবে বিলিয়ে দেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের ত্যাগ কবুল করুন, তাঁদের চোখের শীতলতা হিসেবে সন্তানদের গড়ে তুলুন এবং উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।



ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য মানুষ এসেছেন, অসংখ্য মানুষ চলে গেছেন। কেউ জ্ঞান দিয়ে, কেউ সাহস দিয়ে, কেউ ক্ষমতা দিয়ে মানুষের মনে ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু এমন একজন মানুষ পৃথিবীতে এসেছেন, যাঁর জীবন একসঙ্গে ঈমানের আদর্শ, চরিত্রের সৌন্দর্য, দয়ার মহিমা, ক্ষমার বিস্ময় এবং মানবতার পূর্ণাঙ্গ পাঠশালা-তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ।

তাঁকে জানতে হলে শুধু তাঁর জীবনের বড় বড় ঘটনা জানলেই হয় না। জানতে হয়-তিনি শিশুদের সঙ্গে কেমন ছিলেন, দুর্বলদের কীভাবে আপন করে নিতেন, শত্রুর প্রতি কেমন আচরণ করতেন, কষ্টের সময় কীভাবে ধৈর্য ধরতেন, বিজয়ের দিনে কীভাবে ক্ষমা করতেন এবং নিভৃতে কীভাবে তাঁর রবের সামনে দাঁড়াতেন।

এই খণ্ডের নাম-'যেমন ছিলেন তিনি'। কারণ আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু তাঁকে নিয়ে পড়া নয়; বরং তাঁকে যেমন ছিলেন, তেমন করে জানা। তাঁর হাসি, তাঁর দয়া, তাঁর বিনয়, তাঁর সাহস, তাঁর ক্ষমা-তাঁর জীবনের সেই মানবিক সৌন্দর্যের কাছাকাছি যাওয়া, যা তাঁকে ভালোবাসার পাশাপাশি তাঁকে অনুসরণ করার প্রেরণা দেয়।

মক্কার নির্যাতন আমাদের শেখায় অবিচল থাকতে; হিজরত শেখায় ত্যাগ ও তাওয়াক্কুল; মদিনার জীবন শেখায় ভালোবাসা দিয়ে সমাজ গড়তে; বিজয় শেখায় ক্ষমা করতে। আর তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শেখায়-মহত্ত্ব শুধু বড় কাজে নয়; মানুষের সঙ্গে একটি কোমল কথা, একটি হাসি, একটি ক্ষমা কিংবা একটি সহানুভূতিশীল আচরণেও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে।

এই খণ্ডের প্রতিটি গল্পের শেষে তাই থাকবে 'আজকের শিক্ষা', 'ভাবো তো' এবং 'আজকের আমল'। 'আজকের শিক্ষা' আমাদের সামনে তুলে ধরবে তাঁর জীবন থেকে নেওয়ার মতো শিক্ষা; 'ভাবো তো' আমাদের নিজের চরিত্রকে তাঁর চরিত্রের আয়নায় দেখতে আহ্বান জানাবে; আর 'আজকের আমল' সেই ভালোবাসাকে একটি বাস্তব সুন্নাহ ও সুন্দর আচরণে রূপ দেওয়ার সুযোগ করে দেবে।

আমার অন্তরের আশা-এই বই পড়ে কোনো শিশু তাঁর প্রতি আরও ভালোবাসায় পূর্ণ হোক, কোনো তরুণ রাগের মুহূর্তে তাঁর ক্ষমাশীলতার কথা স্মরণ করুক, কোনো পরিবার তাঁর কোমলতার শিক্ষা গ্রহণ করুক, কোনো হৃদয় তাঁর সুন্নাহর প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হোক।

কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন পড়ার সবচেয়ে সুন্দর উদ্দেশ্য শুধু জানা নয়-জীবনকে তাঁর আলোয় সুন্দর করে তোলা।

তাঁকে জানার পথে আমরা যত এগোব, ততই হয়তো আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জেগে উঠবে-তিনি কেমন ছিলেন? আর সেই প্রশ্নের পরেই আরেকটি প্রশ্ন আমাদের নিজেদের সামনে দাঁড়াবে-আমি তাঁর কতটা মতো হতে পেরেছি?

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গভীর ভালোবাসা দান করুন, তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্যে আমাদের জীবনকে সুশোভিত করুন, তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের তাওফিক দিন এবং কিয়ামতের দিন তাঁর শাফাআত নসিব করুন। আমিন।

দোয়াপ্রার্থী

মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

চরমটুয়া, সদর, নোয়াখালী

১০ই রবিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরী

২৪ই আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

আল-আমিন ﷺ ১১
শৈশবেই নবুওয়তের সুসংবাদ ১৮
আল্লাহর জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ২৩
মরুভূমির বুকে বরকতের প্রথম সূর্যোদয়.....২৯
মিরাজ : পৃথিবী থেকে সপ্তম আসমান-এক অলৌকিক মহাযাত্রা৩৩
এক বিস্ময়কর রজনীর অবিস্মরণীয় ইতিহাস.....৩৮
রক্তাক্ত তায়েফ, ক্ষমার মহিমা.....৪২
হিজরতের পথে-.....৪৬
পুরস্কারের লোভে ধাওয়া-অতঃপর মাটিই থামিয়ে দিল!.....৫২
মদিনার আকাশে সেই আনন্দের দিন.....৫৭
পেটে পাথর, হাতে কোদাল.....৬৩
প্রতিশোধের আগুন থেকে ঈমানের আলো..... ৭১
খাইবারের বিষমাখা খাবার ৭৭
কে তোমাকে রক্ষা করবে? ৮৩
যে শিক্ষক ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বদলে দিয়েছিলেন..... ৮৬
যে ধৈর্য বদলে দিয়েছিল একটি হৃদয়.....৯০
এক পেয়ালা দুধ ৯৬
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ ১০০
লেখক পরিচিতি.....১০৩

তৃতীয় পর্ব

মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ

আল-আমিন ﷺ

যে আমানতদারির সামনে শত্রুরাও মাথা নত করেছিল

মক্কার আকাশে তখনও নবুয়তের সূর্য উদিত হয়নি। কাবার চারপাশে মানুষের ভিড়। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে এই পবিত্র ঘর তাওয়াফ করতে। কিন্তু সেই সময়ের মক্কা ছিল নানা অন্যায়, অহংকার, গোত্রগত বিদ্বেষ আর মূর্তিপূজার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

শক্তিশালী গোত্র দুর্বলকে চাপা দিত। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মানুষের অধিকার আত্মসাৎ করা- এসবও সমাজের অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না। কিন্তু সেই অন্ধকার সমাজের মাঝেই একজন মানুষ ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা।

তিনি মিথ্যা বলতেন না।

কাউকে ধোঁকা দিতেন না।

কোনো আমানতের খিয়ানত করতেন না।

কথা দিলে কথা রাখতেন।

মানুষ তাঁর কাছে নিশ্চিন্তে নিজের সম্পদ রেখে যেত।

আর তিনি ছিলেন- মুহাম্মদ ﷺ। নবুয়তের আগে মানুষ তাঁকে ডাকত-

"আল-আমিন" অর্থাৎ- বিশ্বস্ত, আমানতদার, নির্ভরযোগ্য।

এই উপাধি কোনো একদিনের ঘটনা থেকে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর তাঁর চরিত্র, সততা ও আমানতদারি দেখে মক্কার মানুষ এই উপাধি তাঁকে দিয়েছিল। এমনকি যারা পরবর্তীতে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়েছিল, তারাও তাঁর সত্যবাদিতা অস্বীকার করতে পারেনি।

শৈশব থেকেই এক অসাধারণ চরিত্র

মুহাম্মদ ﷺ যখন ছোট, তখন থেকেই তাঁর জীবনে এমন কিছু গুণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল।

তিনি অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতেন।

অন্যায় কাজে অংশ নিতেন না।

মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতেন।

কারও সম্পদ আত্মসাৎ করতেন না।

কাউকে প্রতারণা করতেন না।

যখন তিনি ব্যবসায় অংশ নিতে শুরু করলেন, তখন তাঁর সততা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা সাধারণত লাভের জন্য পণ্যের ভালো দিক বাড়িয়ে বলে, খারাপ দিক গোপন করে। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। পণ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তিনি তা গোপন করতেন না। লাভ কম হলেও সত্য বলতেন। কারণ তাঁর কাছে সম্পদের চেয়ে চরিত্র ছিল মূল্যবান। এই কারণেই মানুষ তাঁর ওপর আস্থা রাখতে শিখেছিল। শত্রুরাও যাঁর কাছে আমানত রাখত

ভাবুন তো!

একজন মানুষকে তাঁর সমাজের লোকেরা এতটাই বিশ্বাস করত যে, তাঁর বিরোধিতা করলেও নিজেদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে জমা রাখত।

এটাই ছিল "আল-আমিন" হওয়ার প্রকৃত অর্থ।

মানুষ জানত-"মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আমার সম্পদ নিরাপদ।"

কিন্তু শুধু সম্পদ নয়- মানুষের বিশ্বাসও তাঁর কাছে নিরাপদ ছিল। কেউ তাঁর কাছে কোনো গোপন কথা বললে তা তিনি প্রকাশ করতেন না। কেউ তাঁর কাছে কোনো দায়িত্ব দিলে তা তিনি যথাযথভাবে পালন করতেন।

তাঁর মুখ থেকে মিথ্যা বের হতো না।

তাঁর হাতে খিয়ানত ঘটত না।

তাঁর চরিত্রে প্রতারণার কোনো স্থান ছিল না।

হজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনা

মুহাম্মদ ﷺ-এর বয়স তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। কাবা শরিফের ভবন তখন পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মক্কার বিভিন্ন গোত্র সম্মিলিতভাবে কাবা পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করল। সবাই আনন্দের সঙ্গে কাজ করছিল। কেউ পাথর আনছে। কেউ দেয়াল নির্মাণ করছে। কেউ কাবার এক অংশ গড়ছে। কাজ এগিয়ে চলল।

অবশেষে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল, যখন হাজরে আসওয়াদ-কালো পাথরটি-তার স্থানে বসানোর সময় হলো। তখনই শুরু হলো বিপত্তি। কারা এই সম্মান পাবে? প্রত্যেক গোত্রই চাইছিল-

"হাজরে আসওয়াদ আমরা স্থাপন করব।"

একটি গোত্র বলল- "আমরাই এই সম্মানের যোগ্য।"

অন্য গোত্র বলল- "না, এই মর্যাদা আমাদের।"

কথা থেকে তর্ক। তর্ক থেকে উত্তেজনা। উত্তেজনা থেকে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, মক্কার মানুষদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিল।

একটি পাথর বসানো!

কিন্তু সেই পাথরকে কেন্দ্র করে যদি গোত্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে! মক্কার মানুষ বুঝতে পারছিল- এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়। চার দিন ধরে উত্তেজনা। বিরোধ এতটাই তীব্র হলো যে কয়েক দিন ধরে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। প্রতিটি গোত্রই নিজের দাবি ছাড়তে রাজি নয়।

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল- পরদিন সকালে কাবা শরিফের দিকে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই সালিশ মানা হবে। সবাই অপেক্ষা করতে লাগল। সকালের আলো ফুটল। মানুষের চোখ কাবার পথের দিকে। হঠাৎ দূরে একজন মানুষকে দেখা গেল।

তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখেই মক্কার মানুষদের মুখে আনন্দের আলো ফুটে উঠল। কারণ তাঁরা তাঁকে চিনত। তিনি ছিলেন-

মুহাম্মদ ﷺ।

তখনও তাঁর ওপর ওহি নাজিল হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিচয় ছিল একটাই-

আল-আমিন।

মানুষের মুখে মুখে ধ্বনি উঠল- "এ তো আল-আমিন! আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।" এক মুহূর্তেই যেন উত্তেজনার আগুন নিভে গেল। কারণ সবাই জানত- যার বিচার আল-আমিন করবেন, সেখানে পক্ষপাত থাকবে না।

এক অসাধারণ সমাধান

মুহাম্মদ ﷺ পরিস্থিতি বুঝলেন। তিনি কোনো একটি গোত্রকে বিজয়ী করে দিলে অন্য গোত্র অপমানিত হবে। আর সমস্যাটি আরও বড় হয়ে উঠবে। তখন তিনি একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর হাজরে আসওয়াদকে সেই চাদরের ওপর রাখলেন। এরপর বললেন-

"প্রত্যেক গোত্রের একজন করে প্রতিনিধি এই চাদরের একেকটি দিক ধরো।"

মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রস্তাবে সবাই রাজি হয়ে গেল। কেউ অপমানিত হলো না। কেউ পরাজিত হলো না। সবাই সম্মান পেল। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন চাদরের একটি করে অংশ ধরল। তারপর তারা হাজরে আসওয়াদকে নির্ধারিত স্থানের কাছে নিয়ে গেল। এবার মুহাম্মদ ﷺ নিজ হাতে পাথরটি তুলে তার স্থানে স্থাপন করলেন।

একটি পাথর, একটি শিক্ষা

দেখুন! একটি সমস্যার সমাধান করতে তিনি শক্তি ব্যবহার করেননি। কাউকে অপমান করেননি। কাউকে হেয় করেননি। কাউকে বলেননি-

"তোমরা ভুল, আমিই ঠিক।"

বরং এমন একটি সমাধান দিলেন, যাতে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারল। এটাই ছিল তাঁর প্রজ্ঞা। এটাই ছিল তাঁর নেতৃত্ব। এটাই ছিল "আল-আমিন"-এর চরিত্র। একজন সত্যিকারের নেতা শুধু নিজের কথা প্রতিষ্ঠা করেন না। তিনি মানুষের হৃদয়ও জয় করেন।

কেন তাঁকে "আল-আমিন" বলা হতো?

"আল-আমিন" শুধু একটি সুন্দর উপাধি ছিল না। এটি ছিল মক্কার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল।

তিনি ছিলেন-

সত্যবাদী- তাই মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস করত।

আমানতদার- তাই মানুষ তাঁর কাছে সম্পদ রাখত।

ন্যায়পরায়ণ- তাই বিরোধের সময় তাঁকে সালিশ মানা হতো।

বুদ্ধিমান- তাই অসম্ভব মনে হওয়া সমস্যারও সুন্দর সমাধান বের করতেন।

বিশ্বস্ত- তাই বন্ধু-শত্রু সবাই তাঁর চরিত্রের ওপর আস্থা রাখত।

এমনকি যখন তিনি মক্কার মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন, তখনও তিনি তাদের সামনে প্রথমে তাঁর নিজের জীবনকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন-

"আমি কি তোমাদের মাঝে দীর্ঘকাল অবস্থান করিনি?" অর্থাৎ- তোমরা কি আমাকে ছোটবেলা থেকে দেখোনি? তোমরা কি কখনো আমাকে মিথ্যা বলতে দেখেছ? তোমরা কি কখনো আমার কাছ থেকে খিয়ানত দেখেছ? তোমরা কি আমার চরিত্র জানো না? তাঁরা তাঁর সত্যবাদিতা অস্বীকার করতে পারেনি। আজকের পৃথিবীতে "আল-আমিন" হওয়ার প্রয়োজন। আজ মানুষ অনেক কিছু অর্জন করতে চায়। কেউ টাকা চায়। কেউ সম্মান চায়। কেউ বড় পদ চায়। কেউ মানুষের প্রশংসা চায়।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের শেখালেন- সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানুষের বিশ্বাস। তোমার কাছে কেউ টাকা রেখে যদি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে-তুমি আল-আমিনের পথে আছো। তোমার কাছে কেউ গোপন কথা বলে যদি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে-তুমি আল-আমিনের পথে আছো। তুমি কথা দিলে যদি মানুষ জানে, "সে কথা রাখবে"-তুমি আল-আমিনের পথে আছো। তোমার কাছে কাজ দিলে যদি মানুষ জানে, "সে খিয়ানত করবে না"-তুমি আল-আমিনের পথে আছো।

মানুষের চোখে তুমি যত বড়ই হও না কেন, যদি তোমার ওপর কেউ বিশ্বাস করতে না পারে, তাহলে সেই বড়ত্বের মূল্য কতটুকু? রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন আমাদের শেখায়-

মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে চাইলে আগে তাদের বিশ্বাস অর্জন করো।

আজকের শিক্ষা

- সত্যবাদিতা মানুষের হৃদয়ে এমন বিশ্বাস তৈরি করে, যা কোনো সম্পদ দিয়ে কেনা যায় না।
- আমানত রক্ষা করা শুধু ইবাদত নয়; এটি একজন মুমিনের ব্যক্তিত্বের পরিচয়।
- বড় সমস্যার সুন্দর সমাধান অনেক সময় শক্তি দিয়ে নয়, প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার দিয়ে করা যায়।
- প্রকৃত নেতা এমন সিদ্ধান্ত নেন, যাতে বিরোধীদেরও সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে।
- মানুষের কাছে বিশ্বস্ত হওয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম মহান চরিত্রের অনুসরণ।
- শত্রুরাও যার সততা অস্বীকার করতে পারে না, প্রকৃত সম্মান তারই।
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য ও আমানতদারি অবলম্বন করলে মানুষের আস্থা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি-দুটিই অর্জন করা যায়।

ভাবো তো.....

- মানুষ কি তোমাকে "বিশ্বাস করা যায়"-এমন একজন মানুষ হিসেবে জানে?
- কেউ তোমার কাছে গোপন কথা বললে তুমি কি তা অন্যের কাছে

বলে দাও, নাকি আমানত হিসেবে নিজের হৃদয়ে রেখে দাও?

- তোমার কাছে কারও টাকা, বই, মোবাইল বা কোনো জিনিস আমানত থাকলে তুমি কি সেটিকে নিজের সম্পদের মতোই নিরাপদ রাখো?
- তুমি কোনো ভুল করলে সত্য স্বীকার করো, নাকি নিজের ভুল ঢাকার জন্য আরেকটি মিথ্যা বলো?
- আজ যদি তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করা হয়-"তোমরা কি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করো?"-তারা কী উত্তর দেবে?

আজকের আমল

- আজ থেকে অন্তত একটি আমানতদারির অভ্যাস শুরু করো।

দিনের শেষে নিজেকে একটি প্রশ্ন করো-

"আজ আমি কি এমন কিছু করেছি, যার কারণে মানুষ আমাকে 'আল-আমিন' বলতে পারে?"

তারপর এই দোয়াটি পড়ো-

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে হেদায়েত করুন।"

আজকের ছোট্ট সংকল্প

"আজ আমি মিথ্যা বলব না, আমানতে খিয়ানত করব না, কারও গোপন কথা প্রকাশ করব না এবং কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করব।"